ঠাস্

আজ ৩১শে ডিসেম্বর ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)। জানালা দিয়ে দেখছি বরফ পড়ছে ঝুরঝুর, মেঘমেদুর ম্লান বিষন্ন আকাশে মেঘের ওপারে বছরের শেষ রক্তরঙ্গীন সুর্য্য ডুবছে কোথাও।

আমার“থ্যাঙ্ক ইউ” ইংরেজী নিবন্ধটা যাঁরা পড়েছেন তাঁদের মনে থাকতে পারে তিরিশ বছর আগে আমরা দুই তরুণ বাংলাদেশ থেকে অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছিলাম ১৯৭৫ সালের ৩১শে আগষ্টে। যে দেশে একবস্ত্রে গিয়ে পড়েছিলাম সেখানে আমাদের না ছিল আশ্রয় দেবার মত কোন আত্মীয়-বন্ধু, না পকেটে একটা কানাকড়ি, না কোন বস্ত্র কোন চপ্পল কোন স্যুটকেস কোন শিক্ষা-সার্টিফিকেট, না ভিসা না পাশপোর্ট। সে অপরিচিত মধ্যপ্রাচ্যে ছিল চন্ড গরম আর অজানা ভাষা। তারপর কেটে গেছে কত শত কাল, তবু যেন মনে হয় সেদিন সকাল। আমার সেই সঙ্গী এখন নিউইয়র্কের লং দ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত তার প্রাসাদোপম বাড়িতে সুখের সংসারে। প্রতি বছর ৩১শে আগষ্ট যে যেখানেই থাকি ফোনে কথা বলার চেষ্টা করি আমরা, কখনো হয় কখনো হয়না। তার বাসায় বছর দশেক আগে সন্ধ্যায় কথা বলছিলাম আমরা। আসলে বলছিল ওর বৌ, আমরা শুনছিলাম শুধু। পেশায় সে নার্স, অনেক হাসপাতালে কাজ করার পর এখন সিনিয়র কর্ত্রী হয়েছে বিশাল এক ওল্ড-হোম অর্থাৎ বৃদ্ধ-নিবাসে। তার ভাষাতেই বলি।

নার্সদের জীবন কি কঠিন তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। এ শুধু পেশা নয়, প্রতিদিনের প্রতি মুহুর্তের এ এক কঠিন সাধনা। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের সাথে থাকতে হয় রোগীর প্রতি প্রেম, তা সে রোগী যেমনই হোক না কেন। এ পেশায় হয়ে উঠতে হয় রোগীর বন্ধু, আত্মীয়। নিজের জীবনের একশ'টা সমস্যার পরে সেটা বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন, আরও কঠিন হয়ে ওঠে বৃদ্ধ-নিবাসে। এখানে রোগী শুধু রোগীই নয়, পঙ্গুও বটে। এদের কেউ কেউ বন্দী হুইল চেয়ারে। কেউ কেউ নিজে খেতে পারেনা, কাপড় পরতে পারেনা, কথা বলতে পারেনা, শুনতে পারেনা, দেখতে পারেনা, গোসল করতে পারেনা, এমনকি শরীরের বর্জ্যও পরিষ্কার করতে পারে না। সবই করে দিতে হয় নার্সকে। অনেক রোগীই আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত, কেউ দেখতে আসে না কোনদিনই।

আমাদের বিরাট ব্যস্ত নার্সিং হোম, বিখ্যাত ও জনপ্রিয়ও বটে। হাজারো কাজ হাজারো সমস্যা, সিনিয়র হিসেবে আমাকে অনেক দায়িত্বই পালন করতে হয়। দোতালা দালানে দু'পাশে হোটেলের মত সারি সারি রোগীর কামরা, মাঝখানে করিডোর। একদিন সে করিডোর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, এক কামরার ভেতর থেকে ভেসে এল শব্দ “ঠাস্”।

ভেতরে ঢুকে দেখি হুইল চেয়ারে বসে আছে রোগীনি, “বুড়ী” বলে সবাই তাকে চেনে। বুড়ী কথা বলতে পারেনা, নড়তে পারেনা, সবই করে দিতে হয়। তার চোখ দেখি অশ্রুতে ছলছল। কান্নাভরা চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছে নার্স। নার্সের সামনে এসে প্রশ্ন করলাম, “তুমি ওকে চড় মেরেছ?”

নার্স মেয়েটা এমনিতে বড্ড লক্ষ্মী, কিন্তু সে আজ হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বলল - “হ্যাঁ, মেরেছি -মেরেছি - মেরেছি। কি করব? কথা শোনে না, গোসল করতে চায় না, কাপড় পরতে চায় না, সবকিছু গায়ের শক্তিতে করে দিতে হয়। কত পারব? কতদিন পারব?”

“এখন কি হয়েছে?”

“গোসল করিয়েছি জোরজবরদস্তি করে, এখন আর জামা পরতে চায় না”।

“গোসল করিয়েছ কতটা গরম পানিতে?”

“কেন, সবাইকে যে টেম্পারেচারে করাই!”

“কোন জামা পরাতে চেয়েছ?”

“এই যে, এটা”।

“তোমাকে বলেছি, তুমি ভুলে গেছ। বুড়ী সব সময় খুব গরম বোধ করে, ও একটু ঠান্ডা পানি চায় গোসলের জন্য। আর, এ জামাটা সবার জন্য ঠিক হলেও ওর জন্য গরম, ওকে আর একটু হাল্কা পরাতে হয়। বুড়ী যা কিছুতে আপত্তি করে তার কোন না কোন কারণ আছে। আমি দুঃখিত, তোমাকে অফিসিয়ালি নোটিস দেব এ দুর্ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য”।

লক্ষ্মী নার্স কেঁদে ফেলল “তা দাও, তাতে অসুবিধে নেই। এটা অ্যামেরিকা, একশ’ একটা চাকরী আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু এইসব রোগীদের আমরা প্রতিদিন প্রতিমুহুর্ত কিভাবে যত্ন নেব? গায়ের জোর খাটাতে আমি নিজের বাড়ীতেও অভ্যস্ত নই, কত আর পারব? আমরাও তো মানুষ, আমাদেরও তো সহ্যের সীমা আছে !”

“না। নার্সদের সহ্যের সীমা থাকতে নেই। তুমি এখন যাও পরের রোগীর কাছে, আমি একে কাপড় পরাচ্ছি”।

যত্নে হালকা জামা পরালাম বুড়ীকে। চুল আঁচড়ে দিলাম, তারপর হুইল চেয়ারটা টেলিভিশনের সামনে বসিয়ে হাতে রিমোট-কন্ট্রোলারটা ধরিয়ে দিলাম, ওটা সে টিপতে পারে। মাথায় হাত বুলিয়ে কপালে চুমু খেলাম অনেক আদরে। বুড়ী অস্পষ্ট হাসিমুখে তৃপ্তিভরা ছলছল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, আমার যত্ন উপভোগ করল।

ষাট বছর আগে নিউইয়র্কে দুই নিঃস্ব কপর্দকহীন তরুণ-তরুণী পরস্পরের হাত ধরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জীবন-যুদ্ধে। কিছুই ছিলনা তাদের শুধু পরিশ্রম করার শক্তি এবং ইচ্ছা ছাড়া। তা-ই করল তারা। শত পরিশ্রমে, নানা দিকের শত প্রলোভনের হাতছানিতেও তারা পরস্পরের হাত ছাড়েনি এক মুহুর্তের জন্য। কোল ভরে এসেছে সন্তানেরা, দুজনে মানুষ করেছে তাদের অনেক আদরে। প্রথমে ছোট্ট একটা দোকান করেছে তারা, ২৪ ঘন্টা খোলা থাকত সেটা। দিনরাত সুকঠিন পরিশ্রমে সে দোকান ফুলে ফেঁপে বড় হয়েছে, তারপর করেছে অন্য ব্যবসা। সেটাও বেড়ে উঠেছে কলাগাছের মত তরতর করে। তারপর তারা পয়সাকড়ি জমিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিয়ে এক ভাঙ্গাচোরা বাড়ী কিনে মেরামত চুনকাম করিয়ে আসবাব কিনে লাইসেন্স বানিয়ে খুলেছে বৃদ্ধ-নিবাস। দিনরাত দু’জনের প্রচন্ড পরিশ্রমে ধীরে ধীরে বড় হয়েছে সেটাও। তারপর একদিন নুতন জমি কিনে বড়সড় এক দালান বানিয়ে শুরু করেছে আধুনিক বৃদ্ধ-নিবাস। কত বড় একটা আর্থিক চ্যালেঞ্জ ছিল সেটা, যা সফল হয়েছে শুধুমাত্র দিনরাত পরিশ্রমের মূল্যে। রোগী বেড়েছে, কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে খ্যাতি। সময়ের সাথে সাথে এককালের তরুণ-তরুণী হয়েছে যুবক-যুবতি, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া এবং শেষে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। ক’বছর আগে বুড়ো হার্টের ব্যামোতে নিজের হাতে বানানো বৃদ্ধ-নিবাসে ভর্তি হয়ে বেঁচে ছিল ক’দিন, তার পরে মারা গেছে। এখন বৃদ্ধাও এখানে প্রহর গুনছে, একা। স্বামীর হাত ধরে যে তরুণী বহু দশকের চন্ড পরিশ্রমে একদিন প্রতিষ্ঠা করেছিল এই বৃদ্ধ-নিবাস, আজ তার কর্মহীন জীবন। আজ সে হুইল চেয়ারে বন্দীনি, তার নিজেরই বানানো বৃদ্ধ-নিবাসে। আজ সে কথা বলতে পারেনা, কিছুই করতে পারে না। কে জানে কত কথা তার মনে হয়, কত বছরের কত স্মৃতি খেলা করে সে মনে।

এই বুড়ী এই বিশাল বিখ্যাত বৃদ্ধ-নিবাসের গর্বিত একচ্ছত্র মালিক-ই শুধু নয়, এর প্রতিষ্ঠাত্রীও।

কে জানে আগামী, আগামী এবং আগামী বছরগুলোতে কি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

ফতেমোল্লা
৩১ ডিসেম্বর ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)